হাঁস পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি)

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

Training on Improved/Modern Livestock Technology Management and Practice

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ঃ ১ দিন

উপদেষ্টা

ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা
পরিচালক
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়

ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান
ট্রেনিং এন্ড কমুউনিকেশন স্পেশালিস্ট
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ ওও প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ): প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
উপজেলা ঃ ---------- জেলা ঃ ----------

প্রশিক্ষণ শিরোনাম ঃ হাঁস পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/ আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্রশিক্ষণের মেয়াদ ঃ ১ দিন।
প্রশিক্ষণের তারিখ ঃ -----/-----/------
প্রশিক্ষণের স্থান ঃ ----------
অংশগ্রহণকারী ঃ (সিআইজি এর নাম) হাঁস পালন সিআইজি খামারী/কৃষক
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ ৩০ জন

প্রশিক্ষণ সূচী

সেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী
১ম সেশন	০৮.৩০ – ০৯.০০	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.০০ – ০৯.৩০	প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.৩০ – ১০.৩০	গ্রামীণ পরিবেশে উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের গুরুত্ব, উন্নত জাতের হাঁসের পরিচিতি, হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান ও হাঁস পালন পদ্ধতি	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
২য় সেশন	১০.৩০ – ১১.০০	চা- বিরতি	
	১১.০০ – ১২.০০	আবদ্ধ অবস্থায় খামার ব্যবস্থাপনায় হাঁস পালনে উন্নত বাসস্থান এর জন্য বিবেচ্য বিষয় এবং হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৩য় সেশন	১২.০০ – ১৩.০০	হাঁস এর খাদ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৩.০০ – ১৪.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন বিরতি হাঁস এর খাদ্য ব্যবস্থাপনা	
৪র্থ সেশন	১৪.০০ – ১৫.০০	হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ প্রতিরোধ	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৫ম সেশন	১৫.০০ – ১৬.০০	সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম; পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৬.০০ – ১৬.৩০	চা - বিরতি	
	১৬.৩০ – ১৭.০০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)

অধিবেশন পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণ শিরোনাম ঃ হাঁস পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ঃ

- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সিআইজি সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
- হাঁস খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রত্যাশা ঃ

- প্রশিক্ষণের ফলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষক/খামারীদের দক্ষতা ব্যবধান কমবে।
- কৃষক/খামারীগন এর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা নিজেরাই খামারের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে।
- কৃষক/খামারীগন প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান নিজ খামারে বাস্তবায়ন করে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং এ বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীগণকে পরামর্শ দিতে পারবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন ঃ

এনএটিপি-২ এর আওতায় নতুন উপজেলাগুলোতে প্রতি ইউনিয়নে ০৩টি করে সিআইজি এবং প্রতি সিআইজিতে ৩০জন খামারী/কৃষক সদস্য রয়েছে। যে কোন একটি সিআইজি-এর এই ৩০ জন সদস্যকে একত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা সুনির্দিষ্ট ফরমে নিজেদের নাম নিবন্ধন করবেন। এ জন্য প্রশিক্ষণ শুরুরআগে প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer) নাম নিবন্ধন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণের জন্য অভীষ্ট দল ঃ ৩০ জন সিআইজি খামারী/কৃষক সদস্য।

নাম নিবন্ধন এর লক্ষ্য ঃ

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ

ব্যানার, নিবন্ধন ফরম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন ঃ

- প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহন।
- প্রশিক্ষণ সংগঠক/ইউএলও উদ্বোধন অনুষ্ঠান এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- সভাপতির অনুমোতিক্রমে যথানিয়মে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুকরণ।

কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সংগঠক যা আলোচনা করবেন ঃ

১. প্রশিক্ষণ শুরু করার সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের জন্য আহ্বান জনাবেন। এ পর্যায়ে সিআইজি সদস্যগণ নিজের নাম ও কোন গ্রামে থেকে এসেছেন জানিয়ে পরিচিত হবেন।

২. পরিচিতি পর্ব শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক তাঁর স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। তিনি বক্তব্য প্রদানের সময় সংক্ষিপ্তভাবে এনএটিপি-২ সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করবেন।

- বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ ও ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে দেশের ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- এনএটিপি-২ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে - প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারী/কৃষকদের খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উপাদিত পণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তিতে বাজারে প্রবেশাধিকারে তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও মৎস্য অীধদপ্তরের যৌথ পরিচালনায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- এ জন্য প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের নির্মীত ভবনে দুইটি কক্ষ নিয়ে FIAC গঠন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে FIAC সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এর CEAL-কে উপস্থিত সিআইজি সদস্যগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তি করণ ঃ

- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে এক জনকে এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে এক জনকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
- সিআইজি সদস্যদেরকে অত্র প্রশিক্ষনে সক্রিয় অংশগ্রহনের আহ্বান ও প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খামারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ পূর্বক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তিকরণ।

১ম সেশন ঃ

গ্রামীণ পরিবেশে উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের গুরুত্ব, উন্নত জাতের হাঁসের পরিচিতি, হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান ও হাঁস পালন পদ্ধতি সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

হাঁস পালনের গুরুত্ব

বাংলাদেশের নদী-নালা, খালবিল, হাওড়, পুকুর, ডোবা এছাড়াও আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে থাকে। এই কারণে একজন খামারী হাঁসকে সামান্য পরিমান খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারে।

উন্নত জাতের হাঁসের জাত ও বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশে হাঁস উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে উন্নত জাতের কয়েকটি হাঁস এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ

- **দেশী জাত ঃ** একটি হাঁসি বছরে ৭০-৮০টি ডিম দেয় এবং উন্নত ব্যবস্থাপনায় আবদ্ধ অবস্থায় এগুলো (দেশী সাদা ও দেশী কালো) বছরে প্রায় ২০০-২০৫টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ১.৭৫ - ২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.০ -১.৫০ কেজি।
- **খাকি ক্যাম্পবেল ঃ** একটি হাঁসি বছরে ২৫০-৩০০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ২.২৫ - ২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫ -১.৫০ কেজি।
- **জিংডিং ঃ** একটি হাঁসি বছরে প্রায় ২৭০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ১.৭৫ - ২.০০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫ -১.৫০ কেজি।
- **ইন্ডিয়ান রানার ঃ** একটি হাঁসি বৎসরে ২৫০-৩০০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ২.২৫ - ২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫ -১.৫০ কেজি।

- **পিকিং** ঃ গায়ের রং সাদা, গড়ে ১৫০- ১৬০ টি ডিম দেয়, ওজন ৪ - ৪.৫ কেজি হয়ে থাকে।
- মাসকোভি ঃ মাংসের জন্য ব্যবহার করা হয়, ডিম উৎপাদন ৮০ -১০০টি, ওজন ৬ - ৭ কেজি হয়।

হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তির স্থান ঃ

- সরকারী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার নারায়নগঞ্জ ও আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার দৌলতপুর, নওগাঁ, সোনাগাজী, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ থেকে বর্তমানে হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে অচিরেই হাঁস প্রজনন খামার সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারি, মাগুড়া ও হবিগঞ্জ হাঁস খামার থেকেও হাঁসের বাচ্চা পাওয়া যাবে।
- অনেকে ব্যক্তি পর্যায়ে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে বিক্রি করে থাকেন।

হাঁস পালন পদ্ধতি ঃ

হাঁস বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা যেতে পারে, যেমন ঃ

১. **আবদ্ধ পদ্ধতি ঃ**
এই পদ্ধতিতে হাঁসকে ঘরের মধ্যে রেখে লালন পালন করা হয়। এই পদ্ধতিতে রাতে হাঁস ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং দিনের বেলায় ঘরের সামনে চারণ (১০-১২বর্গফুট) এ ঘুরে বেড়ায়। এই পদ্ধতি ৩ প্রকার ঃ মেঝেতে লালন পালন, খাঁচায় লালন পালন এবং তারের জালের ফ্লোর।

- **ফ্লোরে লালন পালন ঃ** এই পদ্ধতিতে মেঝেতে লিটার (তুষ) এর উপর হাঁস পালন করা হয়।
- **খাঁচায় লালন পালন ঃ** এই পদ্ধতিতে খাঁচাগুলো একটির পর একটি স্তরে স্তরে রেখে হাঁস পালন করা হয়।
- **তারের জালের ফ্লোর ঃ** এই পদ্ধতিতে ফ্লোর থেকে উঁচু করে তারের জাল দিয়ে মাচা প্রস্তুত করে হাঁস পালন করা হয়। ফলে ফ্লোরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জায়গা কম লাগে।

২. **অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিঃ**

- এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলো রাতে ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং দিনের বেলায় ঘরের সামনে চারণ (১০-১২বর্গফুট) এ ঘুরে বেড়ায়।
- খাদ্য ঘরের ভিতরে অথবা চারণে দেয়া যেতে পারে। তবে সুবিধাজনক হারে চারণে দেয়া ভাল।
- ঘরের সাথে একটি পানির চৌবাচ্চা দেয়া যেতে পারে যার প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৬-৮ ইঞ্চি হয় যাতে হাঁসগুলো সহজে পানি খেতে এবং ভাসতে পারে।

৩. **মুক্ত রেঞ্জ পদ্ধতি ঃ**

- এই পদ্ধতিতে হাঁসকে কেবলমাত্র রাতের বেলায় ঘরে আটকিয়ে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় হাঁস বিভিন্ন জায়গায় যেমন-নদী নালা, খালবিল, হাওড়, পুকুর, ডোবায় বেড়িয়ে খায়।
- পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের জন্য ৩ বর্গফুট জায়গা দরকার এবং বাড়ন্ত হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গা দরকার।

৪. **হার্ডিং পদ্ধতি ঃ**

- এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে কোন প্রকার ঘরে রাখা হয়না। যে সমস্ত জায়গায় খাবার আছে সেই সকল এলাকায় হাঁসগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিন খাদ্যগ্রহণ করে রাতের বেলা হাঁসগুলোকে কোন একটি উঁচু জায়গায় আটকিয়ে রাখা হয়। এভাবে হাঁসগুলোকে একটি নির্দিষ্ট জায়গার কিছুদিন খাওয়ানোর পর অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

৫. ল্যানটিং পদ্ধতিঃ

এই পদ্ধতিতে বড় বড় বিল, হাওড়, জলাশয় এবং আশে পাশে ঘর তৈরী করে হাঁস পালন করা হয়, যাতে হাঁসগুলো রাতের বেলায় থাকে। প্রতিটি ফ্লকে ১০০-২০০টি হাঁস থাকে।

হাঁসের বাসস্থান ও ঘরের ব্যবস্থাপনাঃ

- হাঁস খুব বেশী গরম ও খুব বেশী ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না । হাঁসের ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে বেশী খরচ না করে সীমিত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। আবার বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে এমন নড়বরে ঘর রাখা উচিৎ নয় যাতে শিয়াল, বন বিড়াল, নেউল, চিকা, ইদুর ইত্যাদি হাঁস ও হাঁসের বাচ্চার ঘরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে পারে।

স্থান নির্বাচনঃ

- খোলামেলা উঁচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত,
- ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জন্মাতে পারে এমন স্থান নির্ধারণ করা উচিত,
- ঘরের আশে পাশে গাছ বা জঙ্গল থাকা এবং মুরগীর খামারের পাশে থাকা ঠিক নয়,
- হাঁসের সংখ্যা এবং কি ধরণের ঘরে হাঁস পালন করা হবে তা বিবেচনা করে ঘর তৈরী করতে হবে।

ঘরের নমুনা ঃ

- অল্প হাঁসের জন্য ছোট ঘর এবং বেশী হাঁসের জন্য বড় স্থায়ী ঘর তৈরী করাই ভাল ।
- লম্বা, সরু এবং চারকোণা ঘর তৈরী করা উচিত।
- গ্রামীন পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুযোর্গ ও পারিপাশিক অবস্থার বিষয় চিন্তা ভাবনা করে ঘরের চালা নির্বাচন করতে হবে।

মেঝে এবং মেঝের পরিমাপ ঃ

- মেঝে অবশ্যই স্যাঁতসেঁতে মুক্ত হবে এবং কোন প্রকার গর্ত থাকবে না।
- ১-২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১/২ বর্গফুট, ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ৫-৭ সপ্তাহ ও এর উপরের বয়সের হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গার দরকার।

খাবার ও পানির পাত্র ঃ

- ঘরে পানির জন্য ওয়াটার চ্যানেল তৈরী করতে হবে যার প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৮-৯ ইঞ্চি।

২য় সেশন

আবদ্ধ অবস্থায় খামার ব্যবস্থাপনায় হাঁস পালনে উন্নত বাসস্থান এর জন্য বিবেচ্য বিষয় এবং হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

তাপমাত্রা ঃ

- হাঁসের জন্য খুব বেশী বা কম তাপ ক্ষতিকর,
- ঘরের তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রী ফাঃ ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত রাখাই সর্বোত্তম।

আদ্রতা ঃ

- হাঁসের ঘরের আদ্রতা ৭০% থাকাই বাঞ্চনীয়,
- অনুকূল পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় লোম গজানো, শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভাল হয়। ঘরের আদ্রতা ৭০% এর বেশী হলে ককসিডিয়া ও কৃমি হয়।

আলো ঃ

- হাঁসের ঘরে প্রথম ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখলে হাঁসের বাচ্চা খাদ্য বেশী খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে,
- ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো থাকা দরকার। এই অতিরিক্ত আলোর জন্য বাল্বের মাধ্যমে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন)ঃ

- হাঁসের ঘর শুষ্ক রাখার জন্য বাতাস চলাচল ব্যবস্থা খুবই জরুরী।
- ঘরের দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ লম্বালম্বি তারের জালের বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্রওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা ঃ

- ব্রুডিং হচ্ছে বাচ্চাকে তাপানো। ব্রুডার হচ্ছে যেখানে বাচ্চাকে রেখে তাপানো হয়।
- ব্রুডিংকালে হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশী হয়ে থাকে। তাই এ সময় বাচ্চার যত্নে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল এর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাচ্চা ব্রুডিং ঘরে নেয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পূর্ব থেকেই ঘর গরম (২৮ - ৩১ সেঃ) করে রাখতে হয়। তা না হলে প্রথম কয়েকদিনের ঠান্ডা এবং কম তাপমাত্রার কারণে বাচ্চাগুলো নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হবে এবং নাভী শুকাতে দেরী হবে। অন্যদিকে তাপমাত্রার ব্যবস্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে বাচ্চার মৃত্যুর হার ২০ শতাংশ থেকে নেমে ৩-৪ শতাংশ চলে আসবে।
- ব্রুডারের নিচে পর্যপ্ত তাপের জন্য প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো দেয়া প্রয়োজন,
- শীতকালে সাধারণতঃ ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাস চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বি,এল,আর,আই উদ্ভাবিত ব্রুডার দিয়ে ব্রুডিং করা যায়।
- চিক গার্ড হচ্ছে বাচ্চাকে তাপানোর জন্য ব্রুডার বক্সের চারিদিকে ঘেরাও করে দেয়া, যাতে বাচ্চা নির্দিষ্ট বেষ্টনীর বাইরে না যেতে পারে। চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়ার আগেই পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে,
- হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঃ

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (ফা)	আলো প্রদান (ঘন্টা/দিন)	বায়ু চলাচল
২	৯০	১৮	ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে। আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ও বাচ্চা সুস্থ্য থাকবে।
৩	৮৫	১৪	
৪	৮০	১২	
৫	৭৫	১২	
৬	৭০	১২	

হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়ার সময় ঃ

সাধারণতঃ চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিৎ নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়ার সময় হলে ১ম দিনই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে পানিতে চরার অভ্যাস করতে হবে। গরমকালে দু'সপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

৩য় সেশন ঃ

হাঁস এর খাদ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- গ্রামাঞ্চলে হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। পুকুর খাল-বিল, নদী ইত্যাদিতে হাঁস চড়ে বেড়ায় এবং এখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে।
- অনেক খামারীগণ হাঁসকে শুধু ধানের কুঁড়া, চাল, গম এসব খেতে দেয়।
- সাধারণত বর্ষা মৌসুমে সম্পুরক খাদ্য হিসেবে বাচ্চা প্রতি ৫০ গ্রাম এবং বয়স্ক গুলোকে ৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা কমে যাবার কারণে ঐ সময় খাবার পরিমাণ (৭০-৮০ গ্রাম) বাড়িয়ে দিতে হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় এ ধরণের পরিবর্তন আনলে হাঁসের ডিম উৎপাদন বেড়ে যায়।

খাদ্য উপকরণে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, ইত্যাদি)।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল, ইত্যাদি)।
- চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট , হাঁস-মুরগরি তৈল, ভেজিটেবল অয়েল, সার্কলিভার ওয়েল, ইত্যাদি)।
- ভিটমিন জাতীয় খাদ্য (শাকসব্জি ও কৃত্রিম ভিটামিন)
- খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক , ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন, ইত্যাদি)।
- পানি ঃ দেহ কোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে। তাই কোন প্রাণি খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছু দিনের বেশী বাঁচে না।
    - সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ।
    - অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপদানের অক্সিডিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
    - দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
    - ডিমের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
    - হাঁস-মুরগির দেহে পানির কাজ ঃ
        - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সাহায্য করে।
        - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে।
        - দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে।
        - দেহের ভিত্তিতে দুষিত পদার্থ অপসারণ করে।
        - দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন, এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।

শর্করা জাতয়ি খাদ্য আবার ২ প্রকার

- দানাদার ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ভুট্টা গম , যব, কাওন, চাউল, ইত্যাদি।
- আঁশ ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যের উপজাত যেমন চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, ভুট্টার গুটেন, কাসাভা, ইত্যাদি।
- হাঁস-মুরগির খাদ্যের বেশীর ভাগ শর্করা পুষ্টি উপাদান যেমন দানাদার শতকরা ৪০ হতে ৬০ ভাগ এবং উপজাত অংশ শতকরা ১০ হতে ৩০ ভাগ ব্যবহার করা হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্য আবার ২ (দুই) প্রকার

- প্রানিজ আমিষ ঃ যে সমস্ত আমিষের উৎস প্রানী থেকে হয় তাকে প্রানীজ আমিষ বলে। যেমন, শুটকি মাছ , শুটকি মাংস মিট ও বোনমিল, ফিদার মিল, লিভার মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট, ইত্যাদি।
- উদ্ভিদ আমিষ ঃ যে সমস্ত আমিষের উৎস উদ্ভিদ থেকে হয় তাকে উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ বলে। যেমন, সায়াবিন মিল, তিলখৈল , তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাকসব্জি, ইত্যাদি।
- বয়সভিত্তিক হাঁসের সুষম খাদ্যে বিভিন্ন দানাদার খাদ্য উপাদান ও উক্ত উপাদানের মিশ্রনের পরিমান নিম্নরুপ ঃ

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের খাদ্য উপদান ও মিশ্রণের পরিমান

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা ০-৬ সপ্তাহ	বাড়ন্ত হাঁস ৭-১৯ সপ্তাহ	ডিম পাড়া হাঁস ২০ সপ্তাহ তদুর্দ্ধ
গম ভাঙ্গা	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৬.০০
ভুট্টা ভাঙ্গা	১৮.০০	১৮.০০	১৬.০০
চালের কুঁড়া	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০
সয়াবিন মিল	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.০০	২.০০	২.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	২.০০	৩.৫০
ডিসিপি	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন খনিজ মিশ্রিত	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০	০.১০
লবন	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

৪র্থ সেশন

হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ প্রতিরোধ সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

হাঁসের দু'টি মারাত্মক রোগ হলো ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা রোগ। এ দু'টি রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সর্ম্পকে আলিাচনা করতে হবে।

হাঁসের নিম্নে বর্ণিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা -

- ❖ ডাক প্লেগ
- ❖ ফাউল কলেরা

ডাক প্লেগ ঃ

- হাঁসের ডাক প্লেগ জীবানু এক প্রকার ভাইরাস। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। তাই খামারে এ রোগের প্রদুর্ভাব ঘটলে দ্রুত সকল হাঁসে ডাক প্লেগ রোগ ছগিয়ে পড়ে। তাই হাঁস চাষ করতে হলে সকল হাঁসকে অবশ্যই নিয়মিতভাবে এ রোগের টিকা দিতে হবে। ডাক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হাঁসের লক্ষন ঃ
    - আক্রান্ত হাঁস দাঁড়াতে পারে না, খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং সাঁতার কাটতে চায়না।
    - বয়স্ক হাঁস বেশী মারা যায়।
    - রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসের পিপাসা বেড়ে যায়।
    - হাঁস পাখা মাটিতে ঝুলিয়ে বসে থাকে।
    - হলুদ রংএর পাতলা পায়খানা হয়।
    - কখনও কখনও পায়খানার সাথে রং দেখা দেয়।
    - নাক দিয়ে পানি ঝরে।

ফাউল কলেরা বা হাঁসের কলেরা ঃ

- হাঁসের কলেরা জীবানু এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া। এই জীবানু হাঁসের দেহে প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে এক প্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং রক্ত চলাচলের সাথে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত হাঁসের মল দ্বারা এ রোগ খাদ্য ও পানিকে দূষিত করে এবং খামারে ছড়িয়ে পড়ে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত হাঁস কিনে আনলেও এ রোগ খামারে ছড়াতে পারে। সকল বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কলেরা রোগে আক্রান্ত হাঁসের লক্ষণ ঃ
    - এ রোগে আক্রান্ত হাঁস খেতে চায়না।
    - পালকগুলো খসখসে হয়ে যায়, চেহারায় অবসন্নতা আসে ও রক্তশূন্য মনে হয়ে ।
    - হাঁসের পিপাসা বেড়ে যায়।
    - পায়খানার রং সবুজ এবং সাদা ও ফেনাযুক্ত মনে হয়।
    - চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
    - এক জায়গায় দাড়িয়ে ঝিমাতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়।

হাঁসের উপরোক্ত দু'টি রোগ ছাড়াও হাঁসের খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কারণ যেমন, আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর বিষক্রিয়ায় হাঁসের মুত্যু ঘটতে দেখা যায়। তাই এ বিষয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। আফলাটক্সিন থেকে রক্ষা করার জন্য খাদ্য তৈরী করার সময় বিশেষ করে ভুট্টাদানা খুব ভালভাবে দেখে নিতে হবে যেন ভুট্টাদানার মুখে কাল দাগ অর্থাৎ ছত্রাক না থাকে। খাদ্য উপাদানে এ ধরণের ভূট্টাদানা বাদ দিয়ে খাদ্য তৈরী করলে অন্ততঃ আফলাটক্সিন সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

হাঁসের রোগ প্রতিকার

হাঁসের রোগ প্রতিরোধে প্রথমে আমাদেরকে রোগ বিস্তারের কারণ জানতে হবে। তা হলে হাঁসের রোগ প্রতিকার করা সহজ হবে।

রোগের বিস্তারের কারণসমূহ ঃ

- হাঁসের সুষম খাদ্যের অভাব।
- সীমাবদ্ধ স্থানে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত হাঁসের অবস্থান।
- অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান বা পরিবেশে হাঁস পালন।
- খামারে রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবাণু, জীবাণু, পরজীবী, ছত্রাক, ইত্যাদির আবির্ভাব।
- খামারীদের হাঁসের রোগজীবাণু বিষয়ে অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা।
- হাঁসকে দুষিত ও ভেজা খাদ্য সরবরাহ করা।

হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয় ঃ

- প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় হাঁসের আচরণ পরীক্ষা করতে হবে।
- খাদ্য খাওয়া ও পানি পান করার পরিমানের উপর হাঁসের স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।
- ঘরে হাঁসের মৃত্যু হলে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে হয় এবং দ্রুত মৃত হাঁসের সৎকারের ব্যবস্থা করতে বেবে।
- খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। এ বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।
- খাদ্য তৈরীর সময় বিশেষ করে ভূট্টাবীজ খুব ভালোভাবে দেখে নিয়ে অন্যান্য খাদ্য উপাদানসহ খাদ্য তৈরী করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।
- স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারের জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- খামারে হাঁসের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা উত্তম।
- মনে রাখতে হবে অসুস্থ হাঁস একবার সংক্রামক রোগে অসুস্থ হলে চিকিৎসায় সেই হাঁস আর পূর্বের মত উৎপাদনশীল থাকে না।
- তাই হাঁসের রোগ প্রতিকার এর জন্য টিকা প্রদান কর্মসূচী হচ্ছে একমাত্র উত্তম উপায়।
- তবে হাঁসের ফাউল কলেরা রোগ প্রতিকারে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হলে এ রোগের জন্য টিকা প্রদানের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত হাঁসকে কেবল ডাক প্ল্যাগ টিকা দিলে চলে।
- গবাদি প্রাণির চিকিৎসা সেবা গ্রহনের জন্য যথাসময়ে ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত FIAC এ গিয়ে সিল (CEAL) এর সহায়তা অথরা উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে গিয়ে Veterinary Doctor এর পরামর্শ নেয়ার জন্য খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- টীকাদান কর্মসূচী নিয়মিত অনুসরণ করলে সম্পূর্ণরূপে হাঁসের উক্ত রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এসব রোগের টিকাদান পরিকল্পনা ও প্রদানের নিয়মাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

হাঁসের রোগ প্রতিরোধক টীকাদান কর্মসূচী ঃ

রোগের নাম	প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	প্রথম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে। দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ (প্রথম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩৬-৪৩ দিন বয়সে পরবর্তী ৪-৫ মাস পর একবার	বুকের মাংসে / প্রয়োগ বিধিমতে
ডাক কলেরা	প্রথম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে ২য় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ পরবর্তী ৬০-৭৫ দিন বয়সে পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পরপর একবার।	ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নীচে/ প্রয়োগ বিধিমতে।

৫ম সেশন

সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম; পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

সিআইজি এর কার্যক্রম ঃ

১. কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (CIG) হচ্ছে কিছু সংখ্যক কৃষক বা খামারীদের নিয়ে এমন একটি সংগঠন যাদের জীবিকা নির্বাহে মূখ্য কর্মকান্ড সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এদের অধিকাংশ সদস্য একই আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

২. এনএটিপি-২ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি প্রাণিসম্পদ CIG গঠন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি CIG-তে ৩০ জন কৃষক বা খামারী সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারী ৮০% এবং বড় ও মাঝারীসহ অনান্য খামারী ২০% সদস্য থাকতে পারবেন। উপজেলার মোট সিআইজি এর মধ্যে নারী সদস্যদের সংখ্যা হবে ন্যূনতম ৩৫%।

৩. CIG পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। গোপন ভোটে বা সমঝোতার ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হবে। এজন্য ৭ (সাত) দিন পূর্বে একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য স্থান, সময় ও তারিখ উল্লেখ পূর্বক নোটিশ প্রদান করতে হবে।

৪. নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে :

১) সভাপতি	-	১ জন
২) সহ-সভাপতি	-	১ জন
৩) সম্পাদক	-	১ জন
৪) কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
৫) সদস্য	-	৫ জন

উক্ত কমিটির নাম জনগণের দেখার জন্য কমিটির তালিকা একটি উন্মুক্ত স্থানে টানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন। কমিটির মেয়াদ হবে ২ বছর। কমিটি গঠন সংক্রান্ত রেজুলেশন রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে মাসিক ও বিশেষ সভার রেজুলেশন উক্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

CIG নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী ঃ

CIG গঠন ও ব্যবস্থাপনা হলো কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে CIGগুলো নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার পরিকল্পণা প্রণয়ন, উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনা, মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ইত্যাদি সম্পাদনে সক্ষমতা অর্জন করবে। UEFT তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। CIG নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

১. নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIG এর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিষ্টারে রেকর্ডভূক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেবেন।

২. নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

৩. নির্বাহী কমিটি সমবায় দপ্তরে CIG নিবন্ধন (CIG Registration) করে CIG-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এর ব্যবস্থা নেবেন।

৪. নির্বাহী কমিটি প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে CIG সদস্যদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উহা সমাধানে প্রতি বৎসর প্রযুক্তি প্রদর্শনী গ্রহণ, গবাদি প্রাণি-হাঁস-মুরগীর কৃমিণাশক ও টিকা প্রদানের ক্যাম্পিং, ইত্যাদি বাস্তবায়নে সিআইজি মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ও তা উপজেলা সম্প্রসারণ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্তে Community Extension Agent for Livestock (CEAL) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৫. উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে CIG সদস্যগণ প্রদর্শণী থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি নিজ নিজ খামারে ব্যবহার করবেন এবং প্রত্যেক CIG সদস্য উক্ত প্রযুক্তি নিজ খামারের পার্শ্ববর্তী কমপক্ষে ৩(তিন) জন নন-সিআইজি কৃষক/খামারীকে গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবেন (পরবর্তীতে উন্নত প্রযুক্তিব্যবহার বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীদেরকেও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে)।

৬. নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সিআইজি ও নন-সিআইজি সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা এবং উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে উৎপাদনের রেকর্ড একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

৭. CEAL এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করে সিআইজি সদস্যদের প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান করবেন।

৮. CEAL সদস্যদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উপকরণ যেমন প্রাণি খাদ্য, মুরগির বাচ্চা, বিভিন্ন সংক্রামক/মারাত্মক রোগের টিকা, উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং ইত্যাদি সময়মত সহজলভ্য করা অথবা পরামর্শ দেবেন।

৯. CIG -এর নির্বাহী কমিটির সভায় প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহনের জন্য CEAL সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাবেন, ইত্যাদি।

১০. নির্বাহী কমিটি মাসে কমপক্ষেএকবার অথবা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়মিতভাবে CIG-এর সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া।

CIG -এর সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ঃ

CIG -এর সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ

CIG-কে একটি কার্যকরী সংগঠন হিসেবে টিকে থাকতে হলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, এর জন্য প্রয়োজন CIG-এর নিজস্ব তহবিল। CIG সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই তহবিল গঠিত হতে পারে। নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIGএর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিষ্টারে রেকর্ডভূক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিবেন। উক্ত তহবিলের মাধ্যমে CIG সদস্যগণ ব্যক্তিগত বা সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে পারে। নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ জন্য-

১. সঞ্চয়ের জন্য প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত পাশবই এবং CIG -এর জন্য একটি রেজিষ্ট্রার খুলতে হবে। রেজিষ্টারটি CIG -এর কোষাধ্যক্ষ সংরক্ষণ করবে।

২. যে কোন তফসিলি ব্যাংকেCIG -এর নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে।

৩. CIG -এর সভাপতি, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ-এর যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে, তবে যে কোন দুইজনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে, যেখানে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।

৪. বার্ষিক সাধারন সভায় CIG -এর আয়-ব্যয় সম্পদ ও দায়ের হিসাব প্রস্তুতপূর্বক উপস্থাপন করতে হবে।

৫. CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৬. CIGহিসাব সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকান্ডের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

৭. সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত তহবিল ব্যক্তিগত বা সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৮. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৯. প্রকল্প থেকে ম্যাচিং গ্র্যান্ট সুবিধা নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করবে ইত্যাদি।

১০. সিআইজি সঞ্চয় কার্যক্রমের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রতিটি সিআইজি-তে ১টি সঞ্চয় রেজিষ্টার রাখতে হবে। সিআইজি সদস্য/সদস্যাদের সঞ্চয়ের হিসাব রাখার জন্য রেজিষ্টারে নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক্রমিক ইং	সদস্য/সদস্যাদের	প্রারম্ভিক/পূর্বের জের	মাসের নাম:					মাসের নাম:	
			এ মাসে জমা	এ পর্যন্ত জমা	এ মাসে উত্তোলন	এ পর্যন্ত উত্তোলন	মাস শেষে ব্যালান্স	এ মাসে জমা	এ পর্যন্ত জমা
১									
২									
৩-২৯									
৩০									
	সঞ্চয়ের লাভ/ অন্যান্য প্রাপ্তি								
	মোট প্রাপ্তি								
	ব্যয়								
	অবশিষ্ট								

বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ঃ

সিআইজির সঞ্চিত তহবিল বিভিন্ন উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সদস্য/সদস্যাদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাবে। এ জন্য সিআইজি সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় যেমন বিনিয়োগযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, ব্যবহারের শর্তাবলী, বিতরণকৃত অর্থ ফেরতের সিডিউল ইত্যাদি সভার কার্যবিবরণীতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। প্রতিটি বিনিয়োগের আলাদা আলাদাভাবে হিসাব রাখতে হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা

১. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষতিকর কর্মকান্ড থেকে পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করা,অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ এর সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের ফলে যাতে পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব না ঘটে সে দিকে সচেতন থাকতে হবে।

২. তাই অত্র প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে পরিবেশ ও সামাজিক বিরূপ প্রভাব হয় এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. প্রাণিসম্পদ সিআইজি মাইক্রোপ্ল্যান প্রণয়নের সময় যাতে জীব বৈচিত্র্য হারিয়ে না যায় বা পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাণির স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা নিতে হবে। এ জন্য পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে সিআইজি ও সিল সদস্যদের-কে উদ্বুদ্ধ পূর্বক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. প্রণির দেহে বিভিন্ন পথে রোগে-জীবনু প্রবেশ করতে পারে, যেমন- মুখ, নাক, পায়ুপথ, দুধের বাট, চামড়ার ক্ষতস্থান, চোখ, ইত্যাদি। সাধারণত পরিবেশ সুরক্ষা না থাকলে এ সকল পথে রোগে-জীবনু সহজেই প্রবেশ করতে পারে। যেমনপরিবেশে বাতাস/পানি দুষিত থাকলে, রোগাক্রান্ত/মৃত প্রাণির যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে চলাচল/স্থানান্তর করা হলে, প্রাণির পরিচর্যাকারী কোন রোগাক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে সুস্থ প্রাণির পরিচর্যা করলে,

প্রাণিকে পঁচা/বাসি খাদ্য সরবরাহ করা হলে, হাট/বজারে অসুস্থ প্রাণি নিয়ে আসলে, ইত্যাদি। তাই পরিবেশ সুরক্ষায় এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রণি যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৬. বাজার/অন্য কোনভাবে ক্রয়কৃত প্রাণিকে বাড়িতে/খামারে এনে সরাসরি অন্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। প্রয়োজন বোধে উক্ত প্রণিকে ৭-২১ দিন পর্যন্ত পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রণির মধ্যে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ না প্রায়, তখন বুঝতে হবে বাড়ির/খামারের অন্যান্য প্রাণির সাথে এই প্রণিকে একত্রে পালতে কোন সমস্যা নাই।

৭. প্রাণিকে সময়মত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের খামারের প্রণিকে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববতী বাড়ি/খামারের প্রাণিকেও ঠিক একই প্রকারের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. পোলট্রির সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে জীবনিরাপত্তায় নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে ঃ

- অসুস্থ প্রাণিকে পৃথকী করণ।
- খামারে অভন্তরে বহিরাগতদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণকরণ।
- একটি সেডে একই বয়সের ব্রীড এর হাঁস/মুরগী পালন।
- স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন।

৯. প্রাণির বাসস্থান/খামার/আঙ্গিনা দৈনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

১০. প্রাণিকে প্রত্যহ পরিষ্কার পানি, টাটকা খাদ্য খাওয়াতে হবে।

১১. প্রাণির খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন করতে হবে।

১২. আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় প্রাণিকে আর্সানিক মুক্ত পানি খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

১৩. প্রণির উৎপাদিত পণ্য যেমন দুধ/মাংশ/ডিম এর গুণগত মান রক্ষায় সচেতন থাকতে হবে।

১৪. প্রাণির খাদ্য উপাদান ভেজালমুক্ত ও গুণগত মান হতে হবে।

১৫. প্রাণিকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

১৬. প্রাণির খামার স্থাপনে লোকালয়/মানুষের বাসস্থান থেকে একটু দূরে করতে হবে।

১৭. অতিরিক্ত শীত/গরম ও খড়া/বন্যা/প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় প্রাণি স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এ সময়ে ঘাস চাষ কম হয় এবং প্রণির খাদ্য অপ্রতুল/দুস্প্রাপ্য থাকে। অনেকে এ সময়ে প্রাণি বিক্রি করে পরবর্তীতে সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই এ দিক বিবেচনায় রেখে অগাম প্রস্তুতি হিসাবে সময়পোযুগী দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৮. সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বার্থ/সুবিধা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৯. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজি সদস্যদের সভায় উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়মিত আলোচনা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পার্শ্ববর্তী নন-সিআইজি সদস্যদেরও বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে জানাতে হবে।

২০. পরিবেশে বায়ু দুষণ কমানোর জন্য প্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সিআইজি/সিল/এডপ্টারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মুরগীর খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা হল সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ যা অবশ্যই রোগ জীবানুর বিস্তারের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। রোগবালাই থেকে মুক্তরাখতে সকল ব্যবস্থা সমূহকে নিশ্চিতকরণ এর নাম

জীবনিরাপত্তা। একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে এমনভাবে পোল্ট্রিফার্ম তৈরি করতে হবে, যাতে সেখানে কোন রোগ বালাই এর জীবানু ঢুকতে না পারে। ফলে খামারিরা লাভবান হতে পারবেন।

মুরগীর রোগবালাই এর মূল কারণ হচ্ছে ঃ

- ভাইরাস (এভিয়ান ইনফুয়েনজা, রানীক্ষেত, ইত্যাদি)
- ব্যাক্টেরিয়া (ফাওল কলেরা, সালমোনেলা, ইত্যাদি)
- ফাংগাস (এসপারজিলোসিস, মোল্ড, ইত্যাদি)
- প্রোটোজোয়া এবং প্যারাসাইট (কক্সিডিওসিস, কৃমি)

এই রোগগুলো যদি খামারে ঢুকতে না পারে তাহলে মুরগির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

রোগ-বালাই ছড়ানোর পদ্ধতি ঃ

নিম্নলিখিতভাবে রোগ ছড়াতে পারে ঃ

- ❖ সরাসরি ছড়ানো
- ❖ মুরগি থেকে মুরগি
- ❖ হাঁস থেকে মুরগি
- ❖ শুকর থেকে মুরগি
- ❖ ইঁদুর থেকে মুরগি
- ❖ বন্যপাখি থেকে মুরগি
- ❖ কুকুর-বিড়াল থেকে মুরগি, ইত্যাদি

মানসম্পন্ন খাদ্য ও পানি ঃ

প্রস্তুতকৃত খাদ্য যেন গুণগত মান সম্পন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাদ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ করলে খাদ্যে মাইকোটক্সিন উৎপন্ন হতে পারে। সেই সাথে অন্যান্য জীবানু যেমন সালমোনেলা, ইকলাই, ককসিডিয়া ইত্যাদির সংক্রমন হতে পারে। খাদ্য ও পানির পাত্র যেন মুরগীর পায়খানা দ্বারা দুষিত না হতে পারে তার জন্য মুরগীর উচ্চতা অনুযায়ী উপরের দিক থেকে পাত্র ঝুলিয়ে দিতে হবে। খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ ঃ

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পোল্ট্রি উৎপাদন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কঠিন ও ব্যয়বহুল নয়। নিচের বিষয়গুলো মেনে চললে সহজেই স্বাস্থ্যকরভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

১। **নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ ঃ** মুরগীর খামারের শ্রমিকরা প্রতিদিন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং হাত পা জীবানুমুক্ত করে শেডে প্রবেশ করবে। প্রথমে অসুস্থ ও মরা মুরগী দ্রুত সরিয়ে ফেলবে এবং নিয়মিত মুরগীর বিষ্ঠা পরিস্কার করবে।

২। **অযাচিত প্রাণি ঃ** খাদ্য এবং অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইঁদুর, বিড়াল, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণির বসবাসের জন্য খুবই সহায়ক। এরা নিজেরা বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং মল মূত্রাদির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।

৩। **পোকাকামড় নিয়ন্ত্রণঃ** পোকা কামড় রোগের উৎস ও পরজীবি বা অন্য রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। এক ব্যাচ শেষ করার পর খামারের সকল আবর্জনা, মাকড়সার ঝুল একত্রে করে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে অথবা কম্পোষ্টিং পিটে ফেলতে হবে। সকল যন্ত্রপাতি ও ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার পানি দিয়ে ধোঁয়ার পর জীবানু নাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।

৪। **হিংস্র জন্তু ও অন্যান্য পাখি নিয়ন্ত্রণ ঃ** এরা বিভিন্ন সংক্রামক ও পরজীবি জনিত রোগের জীবানু বহন করে। মৃত মুরগী যত্রতত্র ফেলে রাখলে সেগুলো খাওয়ার জন্য খামারে কাক বা বন্য পাখি, বন বিড়াল, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি আসতে পারে। খামারের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে এবং বন্য পাখি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

৫। **মৃত মুরগী সৎকার ঃ** মৃত মুরগীর দেহাবশেষ নিজেই রোগের উৎসে পরিণত হয় যা খামারের অন্যান্য মুরগীতে এবং আশেপাশের খামারের সংক্রমনের উৎস হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত মুরগীর সৎকার করা যায়। যেমনঃ (ক) পোড়ানোঃ সংক্রামক জীবানুকে ধ্বংস করার সর্বোত্তম পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে ধোঁয়াবিহীন, দুগ্ধবিহীন পোড়ানোর চুলি বাজারে সহজলভ্য। (খ) গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাঃ পরিবেশ আইন মেনে বড় গর্ত করে আবর্জনা গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাই উত্তম। এতে শিয়াল, কুকুর জাতীয় প্রাণী বর্জ্যের নাগাল পাবে না। সাধারণ বর্জ্যের জন্য ছোট গর্ত করে বিভিন্ন বর্জ নিষ্কাশন করা যায়।

৭। **পৃথকীকরণ ঃ** অনুজীবের বিস্তার পৃথকীকরণের মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব। রুগ্ন বা আক্রান্ত মুরগীকে স্বাস্থ্যবান নিরোগ মুরগী থেকে পৃথক করে রাখা উচিত এবং নিরোগ মুরগীকে পরিচর্য্যার জন্য ভিন্ন শ্রমিক নিয়োগ করা উচিত। সবচেয়ে ভাল হয় রুগ্ন মুরগীকে বর্জ্য হিসেবে সৎকার করে ফেলা, কারণ এই সব রুগ্ন মুরগী আরোগ্য লাভ করলেও দীর্ঘ সময় ধরে জীবানুবাহক হিসেবে কাজ করতে পারে।

৮। **ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ঃ** ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং খামারের মালিকগণকে পরিচ্ছন্নতা নিয়মাবলী অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। খামারে দর্শণার্থী প্রবেশ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কোন দর্শণাথী মুরগীর শেডে প্রবেশ করতে চায় তবে জুতা পরে জীবানুনাশক দ্রবণে হাত পা ধুঁয়ে খামারে প্রবেশ করতে হবে।

৯। **টিকা প্রয়োগ ঃ** মুরগীকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য টিকা দেওয়া অত্যাবশ্যক। কিছু রোগ সঠিক সময়ে গুণগত মান সম্পন্ন টিকা প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব।

পরিবেশ সুরক্ষায় খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা ঃ

১. গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদির সরবরাহকৃত খাদ্যের ৫০-৬০% মল ও মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে যা আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে নষ্ট বা অপচয় হওয়ার কারণে পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে।

২. খামার ব্যবস্থাপনায় গবাদিপ্রাণিকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করায় রুমেন থেকে মিথেন উৎপাদন প্রায় ৩০% হ্রাস পায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রাণির চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত পশু-পাখী যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৪. প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

৫. পরিবেশ সুরক্ষায় গোবর/বিষ্ঠা, মূত্র, প্রণি খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে ও সময়মত অপসারণ করলে পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। একাজে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করা যেতে পারে।

৬. গোবর/বিষ্ঠা থেকে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত করা হলে একদিকে পরিবেশে দূর্গন্ধ দুর হয় ও অন্যদিকে উৎপাদিত কম্পোষ্ট সার কৃষিতে ব্যবহার করায় কৃষির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৭. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী উৎপাদন হওয়ায় দুষণমক্ত বায়ু ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নত মানের জৈব সার উৎপাদন হয়। তাই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সামাজিক নিরাপত্তায় অবদান রাখছে।

৮. বর্জ্য সঠিকভাবে কম্পোষ্ট করা হলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মারা যায় ও প্রাণির রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়।

৯. খড় এর সাথে মোলাসেস মিশিয়ে গো/মহিষকে খাওয়ালে গো/মহিষ থেকে ৩০-৩৫% মিথেন গ্যাস উৎপাদন কমে আসবে এবং পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

কম্পোস্টিং এর মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

কম্পোস্ট ও কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া

- ❖ কম্পোস্ট হচ্ছে পচাঁ জৈব উপকরণের এমন একটি মিশ্রণ যা উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে অনুজীব কর্তৃক প্রক্রিয়াজাত হয়ে উদ্ভিদের সরাসরি গ্রহন উপযোগী পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ করে।
- ❖ কম্পোষ্টিং বা পচানো হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি জৈবপচন প্রক্রিয়া, যা জৈব পদার্থকে স্থিতিশীল দ্রব্যে রূপান্তর করে।
- ❖ যে সকল অনুজীব পচনশীল পদার্থকে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার কবে, সে সকল অনুজীবের উপর এ প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।
- ❖ কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়ায় বর্জ্যের গন্ধ ও অন্যান্য বিরক্তিকর সমস্যা সম্বলিত পদার্থকে স্থিতিশীল গন্ধ ও রোগ জীবানু, মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের প্রজননের অনপুযোগী পদার্থে রূপান্তরীত করে।
- ❖ এই প্রক্রিয়াটি চলার সময় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরিত্যক্ত বর্জ্যে প্রক্রিয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে রোগ জীবানু ধ্বংস হয়ে যায়।
- ❖ মুরগির বিষ্টা ও আবর্জনার প্রকারভেদে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত হওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে কম্পোস্ট সার হিসাবে তখনই উপযুক্ত হবে যখন তার রং গাড় বাদামী হবে, তাপ কমে আসবে এবং একটা পঁচা গন্ধ বের হবে।
- ❖ কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য খামারের একপাশে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে স্থানটি চারদিকে নির্দিষ্ট মাপের (দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট ও গভীরতা ৫ ফুট) ইট দিয়ে ঘিরে একটি পিট তৈরী করতে হবে। জৈব বর্জ্যের মিশ্রণ খড়, মুরগীর দেহাবশেষ, বিষ্ঠা ও পানির অনুপাত হবে যথাক্রমে ১ ঃ ১ ঃ ১.৫ ঃ ০.৫ । প্রতি স্তরে তিন ভাগ পানি যোগ করতে হবে। উক্ত অনুপাত ঠিক রেখে মিশ্রণটি তৈরী হলে দ্রুত এবং গন্ধহীনভাবে বর্জ্য কম্পোষ্টিং হবে। কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া ১৪ দিনের মধ্যে সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, সারা দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা ও সমাপ্তিকরণ ঃ

- প্রশিক্ষণ সংগঠক প্রশিক্ষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।
- তিনি প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাবেন।
- এ সময় প্রশিক্ষণার্থীগণ খোলামেলাভাবে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করবেন এবং প্রশিক্ষণ থেকে তাঁদের প্রাপ্ত জ্ঞান খামার পরিচালনায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোকপাত করবেন।
- পরিশেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক এক দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা করবেন এবং সিআইজি সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ নিজ খামারে কাজে লাগিয়ে প্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।